Vol. 53 | No. 1 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

হাসান হাফিজুর রহমানের একুশে ফেব্রুয়ারী

Volume	53
Issue	1
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Rafat Alam
Published online	October 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v53i1.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i1.10
Pages	২১৩-২২৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

হাসান হাফিজুর রহমানের *একুশে ফেব্রুয়ারী*

মো. রাফাত আলম মিশু*

'একটি মহৎ দিন হঠাৎ কখনো জাতির জীবনে আসে যুগান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারী এমনি এক যুগান্তকারী দিন। শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নয়, একুশে ফেব্রুয়ারী সারা দুনিয়ার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা।'– এই কথাগুলো দিয়ে সূচিত হয়েছে হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩) সম্পাদিত একুশের প্রথম সংকলনগ্রন্থ *একুশে ফেব্রুয়ারী*-র ভূমিকাংশ। বাঙালি জাতির জাতীয়তাবোধের প্রথম সার্থক স্বাক্ষর ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালিকে মুক্তি দিয়েছিল দীর্ঘ দিনের আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে। এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের বীজমন্ত্র। জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যে আত্মজাগরণ ও আত্মআবিষ্কারের প্রয়োজন, বাঙালি প্রথম তা অনুধাবন করে তার ভাষাচেতনার মধ্য দিয়ে; খুঁজে পায় জাতীয়তাবোধের মৌল সূত্র – ভাষা। বাঙালি জাতি নিঃসন্দেহে একটি ভাষাভিত্তিক জাতি। আর তার জাতীয়তাবাদী চেতনার সূচনাবিন্দু ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি। এই দিন একই সঙ্গে বাঙালির আত্মত্যাগ ও আত্মজাগরণের দিন। জাতিগত অধিকার আদায়ের পথ কখনোই মসৃণ ছিল না বাঙালির জন্য। সেই অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রাজপথে প্রাণ দিতে হয়েছিল বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ আরও অনেককে। তাঁদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। মৃত্যুই বহন করে আনে লক্ষ কোটি প্রাণের বার্তা। বাঙালি মুসলমানের মধ্যবিত্ত স্তরে আরোহণ-পর্বে যখন সে বাঙালি না মুসলমান – এই দ্বন্দ্বে হচ্ছিল ক্ষত-বিক্ষত, সেই সংকট-সন্ধিতে সে পেয়ে যায় তার আত্মপরিচয় – সে বাঙালি, তার ভাষা বাংলা। সে জেনে নিল – বাংলা তার সত্তার কত গভীরে, কত নিবিড়ভাবে ছড়িয়ে আছে অস্তিত্বের সমগ্রটা জুড়ে। ১৯৫২ সালের এই রক্তিম অথচ প্রাণদায়িনী একুশে ফেব্রুয়ারির এক বছর পর ১৯৫৩ সালে একুশের শোক, ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও সামূহিক সম্ভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হল একদল দুঃসাহসী তরুণের রক্তের অক্ষরে লেখা সাহিত্য-সংকলনগ্রন্থ *একুশে ফেব্রুয়ারী*।[1] সম্পাদক হিসেবে ঐতিহাসিক

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দায়িত্বটি পালন করেন পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি হাসান হাফিজুর রহমান। 'ভাষা আন্দোলনের শিল্পিত আবেগপুঞ্জকে সংরক্ষিত করার এই কর্মোদ্যোগ, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ হাসান হাফিজুর রহমানের জীবনচেতনার এক গৌরবোজ্জ্বল প্রান্ত। জাতীয় ইতিহাসের এক মহত্তম অধ্যায়ের রক্তাক্ত অনুভূতিপুঞ্জকে গ্রন্থবদ্ধ করে বাঙালি জাতির জীবন ও শিল্পচেতনা পটভূমিতে তিনি মর্যাদার স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।' (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৩ : ২৪) দেশ-বিভাগোত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে প্রথম সাহিত্য সংকলন হিসেবেও *একুশে ফেব্রুয়ারী* স্বীকৃত।[২] এই সময়ে খুব সহজ ছিল না এমন একটি সাহিত্য-সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করা। একদিকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষু, অপরদিকে স্বাধিকার চেতনার অগ্নিমন্ত্রে জেগে ওঠার শক্তি। শেষ পর্যন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার মতো বেরিয়ে এলো ওই সময়ের তরুণপ্রাণ কবি–সাহিত্যিকদের রক্তস্নাত শব্দাবলি *একুশে ফেব্রুয়ারী*।

একুশে ফেব্রুয়ারী প্রকাশ করতে প্রথমত ও প্রধানত সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান। আন্তরিক প্রণোদনা থেকেই তাঁর এই কর্মোদ্যোগ। সংকলন প্রকাশের ব্যয় নির্বাহ করতে তিনি পৈতৃক জমি ও ফসল বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। এই তথ্যটি দিয়েছেন সংকলনের প্রকাশক ও ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মোহাম্মদ সুলতান। (মোহাম্মদ সুলতান, ১৯৮৩ : ৬৩)

একুশে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে।[৩] প্রকাশের অব্যবহিত পরেই তৎকালীন সরকার একে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে ও সরকার গঠন করে। তাদের শাসনামলে, ১৯৫৬ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। *একুশে ফেব্রুয়ারী* প্রকাশ করে পুঁথি পত্র প্রকাশনী। প্রকাশক মোহাম্মদ সুলতান। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন আমিনুল ইসলাম এবং ভেতরে বেশ কয়েকটি রেখাঙ্কন ও ছাপচিত্র এঁকেছেন মুর্তজা বশীর ও অন্যান্য। সংকলনটির প্রথম সংস্করণ ক্রাউন সাইজে তৈরি করা হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৮৩। দাম দু টাকা আট আনা। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশ করেছে। ১৯৮৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পুঁথি পত্র প্রকাশনীর প্রকাশক মোহাম্মদ সুলতানের কন্যা সুস্মিতা সুলতানা সংকলনটির আদিরূপ ওই প্রকাশনী থেকেই প্রকাশ করেন। এতে অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে প্রচ্ছদ, ভেতরের ছাপচিত্র, রেখাচিত্র এবং বর্ণের ফন্টও।

একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলনগ্রন্থে হাসান হাফিজুর রহমানের ভূমিকাসহ মোট তেইশটি রচনা স্থান পেয়েছিল, যার মধ্যে একটি প্রবন্ধ, এগারোটি কবিতা, পাঁচটি গল্প, দুটি নকশা, দুটি গান, 'একুশের ঘটনাপঞ্জী' শীর্ষক একুশের ইতিহাস। আনিসুজ্জামানের (জ. ১৯৩৭) হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে উৎসর্গপত্র (বিশ্বজিৎ, ২০১৪ : ১৩৪); যখন তিনি ষোল বছরের কিশোর। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল :

যে অমর দেশবাসীর মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছে
একুশের শহীদেরা,
যে অমর দেশবাসীর মধ্যে অটুট হয়ে রয়েছে
একুশের প্রতিজ্ঞা,
তাঁদের উদ্দেশ্যে

অর্থাৎ প্রবল স্বাজাত্যবোধ, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করে, একুশের শহিদদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে এই সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এই বোধের প্রকাশ সংকলনভুক্ত প্রতিটি রচনার মধ্যে স্পষ্ট।

সম্পাদকীয় বা ভূমিকাংশে হাসান হাফিজুর রহমান সংহত বাণীবন্ধনে একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভ ছিল কৃত্রিম আর মেকি। এরই ধারাবাহিকতায় জাতি নিপতিত হয়েছিল শোষণের অন্ধকারে। এই অন্ধকারের বিরুদ্ধে, জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জনতার গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে একুশে ফেব্রুয়ারি নতুন চেতনায় উন্নীত করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন কেবল ওই সময়ের জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। বরং তা হয়েছিল ভবিষ্যৎমুখী –

> একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রথম ব্যাপক পশ্চাদপদসারণের সূচনা করেছে। সূচনা করেছে জনতার ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়াভিযান এবং সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক নবজাগরণের। একুশে ফেব্রুয়ারী তাই পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি অশেষ গৌরবমণ্ডিত ক্রান্তিকালের দিন। (পৃ. ৩)

আলী আশরাফ রচিত 'সকল ভাষার সমান মর্যাদা' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক স্বৈরাচারী মনোভঙ্গির বিপরীতে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে একুশের চেতনা কেবল বাংলার মর্যাদা রক্ষার দীক্ষায় দীক্ষিত করে না বরং সকল ভাষার মর্যাদা রক্ষার শিক্ষাও দেয়। বিশেষ করে পশ্চাৎপদ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষার অধিকার রক্ষাও একুশের চেতনার অংশ বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, কেবল বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও হবে স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্রবিরোধী। তাই একুশের চেতনায় উজ্জীবিত বাঙালিকে হতে হবে আরও উদার ও প্রগতিমুখী। এ সংক্রান্ত তিনি পাঁচটি দাবিও উত্থাপন করেছেন। একুশের অগ্নিগর্ভে অবস্থান করেও কতটা দূরদৃষ্টি ও উদার মানসিকতার চর্চা শুরু হয়েছিল সেই সময়, তারই প্রকাশ ঘটেছে আলী আশরাফের এই প্রবন্ধে।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকেই নয়, সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল সাহিত্যের জগৎকেও করেছিল আলোড়িত। বলতে দ্বিধা নেই, চল্লিশের দশকে পাকিস্তান-আন্দোলনে দুই বাংলার অনেক প্রগতিশীল

মুসলমান তরুণ কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ৪৭-এর দেশভাগ-পরবর্তী পাকিস্তানি শাসকদের শোষণমূলক ও সাম্রাজ্যবাদী আচরণ এদেশের উদার ও রাজনীতি-সচেতন কবি ও লেখকদের আহত করে দারুণভাবে। তখনও অনেকে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তাঁদের দ্বিধামুক্তি ঘটাল, খুলে গেল সৃজনশীলতার অর্গল। আমাদের সাহিত্য খুঁজে পেল তার আপন ঠিকানা। বিশেষত, কবিতা রচনায় অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে স্থান করে নিল একুশ। কবিতায় প্রতিফলিত হল একুশের ঘটনা ও একুশের চেতনা। এ সময়ে ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক কবিতা রচিত হয়েছে অসংখ্য। পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত কবিদের যাত্রাবিন্দুও এই একুশে ফেব্রুয়ারি এবং তারই দালিলিক সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*।

সংকলনভুক্ত এগারোটি কবিতার কোনো পৃথক শিরোনাম নেই। সে হিসেবে প্রতিটি কবিতাকে 'একুশের কবিতা' বলা যায়। তবে এগারোতম কবিতা – হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতাটির নাম 'অমর একুশে; যা রচিত হয়েছিল ১৯৫২ সালের মার্চ/এপ্রিলের দিকে। কবি নিজেই এক সাক্ষাৎকারের এ তথ্য জানিয়েছেন। (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৩ : ২৩২) এই সংকলনে যাঁদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা হলেন– শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৩৬), আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫-১৯৭৬), ফজলে লোহানী, আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৮৯৪-২০০১), জামালুদ্দিন, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫) ও হাসান হাফিজুর রহমান।

শামসুর রাহমানের কবিতায় পরিচয় মেলে শিল্পিত শোক, ক্ষোভ আর ধিক্কারের। সঙ্গে যোগ হয়েছে আবহমান বাংলার প্রকৃতির অনুষঙ্গ। স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী সাঁড়াশি দিয়ে আমাদের অধিকার হরণ করতে উদ্যত হলেও, আমাদের দেখার চোখকে অন্ধ করে দিতে চাইলেও চেতনার গভীর তলে যে বিদ্রোহী সত্তা জাগরূক থাকে, তাকে দমাতে পারে না কেউ। তাই কবির প্রত্যাশা –

> প্রমেথেউসের গানের মতো আমার গলার রৌদ্রোজ্জ্বল চীৎকার
> কাঁপিয়ে দেবে এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস,
> ফেটে চৌচির হয়ে যাবে মিশরীয় স্ফিংসের স্থবিরতা,
> খসে যাবে তোমাদের রাত্রির দীপ্তিমান তারা, দিনের সূর্য ॥ (পৃ. ১৯)

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে একুশের শহিদদের আত্মত্যাগ ও আর্তনাদ। এই আর্তনাদই জাগিয়ে তোলে আমাদের অবচেতনের প্রতিবাদী সত্তাকে। জন্ম নেয় একটি সামষ্টিক বোধ।

আবদুল গণি হাজারীর কবিতাতেও আছে একুশের রক্তাক্ত আত্মত্যাগ ও জাতীয় জীবনে তার অভিঘাতের চিত্র। একুশ এমন এক শক্তি, যা ঝড়ের মতো সবকিছুকে এলোমেলো করে দিয়ে যায় এবং মৃত্যু থেকে জন্ম নেয় অসংখ্য জীবন। একুশের মৃত্যু জীবনদায়িনী মৃত্যু, আশাবাদের রক্তবীজ –

বাতায়ন খুলে দেখি আমি,
আকাশের কোণে কোণে
এখনও লেগে আছে মেঘ।
আমার-ত মনে হয়
এই মেঘে আসবে বর্ষণ
এই মেঘে বুনে যাবে
অসংখ্য জীবন ॥ (পৃ. ২৩)

একুশে ফেব্রুয়ারি রেণুকণার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। সব শ্রেণি-পেশার মানুষ অনুভব করেছিল মৃত্যুমিছিলের শোক, চেতনায় জেগেছিল প্রতিবাদ। শহর থেকে গ্রাম, রেল-কলোনি, কেরানির ঘর, কিষাণের ঘর; কামার-মাঝি-দোকানি-মুদি-কৃষক সবাই একাত্ম হয়েছিল অভিন্ন প্রশ্নে। শ্রদ্ধায় পুরো জাতি হয়েছিল বিনত। এমনই আবেগপুঞ্জকে কাব্য উপাদান করে তুলেছেন ফজলে লোহানী তাঁর কবিতায়।

একুশের প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ভেঙে ফেললে আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন প্রতিবাদী শব্দমালা। 'স্মৃতিস্তম্ভ' (পরবর্তীকালে নামকরণকৃত) কবিতায় কবি কামনা করেছের সঙ্ঘশক্তির জাগরণ। এর মধ্যে আছে জাতীয়তাবাদী চেতনার সুর। কবির পঙ্‌ক্তিমালায় প্রকাশ পেয়েছে অভিন্ন জাতীয়তাবোধে পূর্ব-বাংলার চারকোটি জনতা/পরিবারের জেগে উঠার অনুভূতি –

স্মৃতি মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিত কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে...
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চারকোটি পরিবার ॥ (পৃ. ২৭)

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'মাগো ওরা বলে' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনে 'একুশের কবিতা' হিসেবে। পরবর্তীকালে তাঁর 'সাতনরী হার'

(১৯৫৫) কাব্যগ্রন্থে এই কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কবিতা স্পর্শ করেছিলো বাংলাদেশের সমগ্র প্রান্তকে। মা ও মাতৃভাষা যে কত নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ, তা-ই এই কবিতায় অকৃত্রিম আবেগে প্রকাশিত হয়েছে। উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে অপেক্ষারত মায়ের কাছে মায়ের স্বপ্নের কাছে ছেলে আর ফিরে আসে না; আসে সন্তানের রক্তভেজা চিঠি। তাই স্নেহময়ী মায়ের চোখে মুখেও বেদনা নয়, প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ –

> এখন,
> মা'র চোখে চৈত্রের রোদ
> পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের
> তারপর,
> দাওয়ায় ব'সে
> মা আবার ধান ভানে,
> বিন্নি ধানের খই ভাজে,
> খোকা তার
> কখন আসে! কখন আসে! (পৃ. ৩৩)

'হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে' কবিতায় শিল্পিত হয়েছে বাঙালির আত্মজাগরণের ইতিহাস। বরকত সালাম রফিক জব্বার – এইসব থোকা থোকা জ্বলন্ত নাম কীভাবে বাঙালির হৃদয়ে বর্শার ফলার মতো গেঁথে আছে, হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় তার পরিচয় উদ্ভাসিত।' (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ৩১৬) শুধু বিষয় নয়, প্রকরণনিষ্ঠায় ধ্রুপদী ধারার পরিচয় মেলে আলোচ্য কবিতায়। প্রবল আবেগকে শমিত করে আবেগের গভীরতাকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন কবি। ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি, ওই দিনের ঘটনা এবং ঘটনাপরবর্তী বাংলার সর্বত্র মানুষের মনে মাতৃভাষার প্রতি যে একাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছিল, জন্ম নিয়েছিল স্বাদেশিক চেতনা, সেগুলোকেই কবিতা দেহে উপাদান করে তুলেছেন হাসান হাফিজুর রহমান। তাঁর উচ্চারণ –

> এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ কটি বছরের ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি
> এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে,
> দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসে
> মায়ের স্নেহের পক্ষে থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছি ঃ
> এবার আমরা তোমার ॥ (পৃ. ৪১)

এছাড়াও আনিস চৌধুরী, জামালুদ্দিন, আতাউর রহমান ও সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় লক্ষ করা যায় একুশের চেতনার প্রজ্বলন।

বাংলা কথাসাহিত্যে, বিশেষত গল্পসাহিত্যে ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব বহুমাত্রিক। বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত গল্পসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে ভাষা-আন্দোলনের পূর্বাপর

প্রসঙ্গ। *একুশে ফেব্রুয়ারি* সংকলনগ্রন্থ ধারণ করেছে পাঁচজন লেখকের পাঁচটি গল্প। শওকত ওসমানের (১৯১৯-১৯৯৮) 'মৌন নয়' গল্পটি একুশে ফেব্রুয়ারি-পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক চলন্ত বাসের যাত্রীদের অন্তর-বাহির প্রতিক্রিয়ায় রচিত। প্রতিদিনকার চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায় না যাত্রীদের মধ্যে। ড্রাইভার, কন্ডাক্টার থেকে শুরু করে বাসে যাত্রী হিসেবে থাকা চাষী, ছাত্র সবাই অজানা কারণে নির্বাক, মৌন। সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ শাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত চওড়া রেখায়িত মুখের এক বৃদ্ধের দিকে। সেই বৃদ্ধ যাত্রীও নীরব, বিষণ্ন, মৌন। সবাই জানে এই মৌনভাবে কারণ; কিন্তু কথা বেরোয় না কারও মুখ থেকে। শেষ পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা বুক থেকে বের হয়ে আসে বৃদ্ধের, নীরবতার জগদ্দল ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তাঁর আর্তনাদে –

> "কি দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলি করে মারল? কি দোষ– কি দোষ করেছিল সে? উঃ–"
>
> কি দোষ করেছিল সে? এই জিজ্ঞাসা ভাসছে তার চোখের উপর। (পৃ. ৫১)

যাত্রীদের মধ্যে যে মৌনভাব বিরাজ করছিল, তা কেবল শোকের নয়। সকলেই অভিন্ন বোধে হয়েছিল একাত্ম– এই গল্প সেই কথাই বলে।

সাইয়িদ আতিকুল্লাহর (১৯৩৩-১৯৯৮) 'হাসি' গল্পের কেন্দ্রে অবস্থান করে ভাষা-আন্দোলনের নিবেদিত কর্মী আবু। আবুর নানা ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে মানুষটি নিরন্তর আন্তরিকতা দিয়ে শঙ্কাকুল মনে সমর্থন দিয়ে যায় – সে একজন ঘরের মানুষ, আবুর নীহার খালা। সংগ্রামের মধ্যেও মানবীয় সম্পর্কগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে আবু ও নীহার খালার কথোপকথনে, তাদের খুনসুটিতে; এবং আবুর প্রতি নীহার খালার অকৃত্রিম বাৎসল্যপ্রীতিতে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-জনতার মিছিলে পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনী কত নির্মমভাবে হামলা চালিয়েছিল, গুলি করে হত্যা করেছিল তাজা তাজা প্রাণ, নিভিয়ে দিয়েছিল কত প্রতিশ্রুতিশীল ও স্বপ্নবান তরুণের জীবনপ্রদীপ তা গল্পবয়ানে উঠে এসেছে। আবু ছিল তেমনি এক স্বপ্নবান কর্মোদ্যমী তরুণ, আর তার সারথি ছিল নীহার খালা। আবু চেয়েছিল নীহার খালার নির্মল হাসি, সন্তান যেমন উন্মুখ হয়ে থাকে মায়ের ভাষার জন্য। কিন্তু আবুর সেই স্বপ্ন পূরণ হয় না। পুলিশ তাকে হত্যা করে। হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় না, তার মৃত দেহও ছিনিয়ে নিয়ে যায় নীহার খালার কোল থেকে। এটাই ছিল ওই দিনের নির্মম থেকে নির্মমতম দৃশ্য। হতবিহ্বল নীহার তখন কেবল বিলাপ করে না। সে আবুর শেষ ইচ্ছা পূরণ করে। সে হাসে। লেখকের ভাষায়–

> চলন্ত গাড়ীটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নীহার খালা হঠাৎ হেসে ওঠেন। প্রচণ্ড অট্টহাসি। মধ্যরাতে ধ্বংসোন্মত্ত প্রেতিনীর অশরীরী হাসির মতো ভয়ঙ্কর, অসহ্য সুন্দর। (পৃ. ৭১)

গল্পকার একুশে ফেব্রুয়ারিকে বাঙালির অন্দর-বাহির দুই পটভূমিতে চিত্রিত করেছেন। আর মানবীয় সম্পর্কের সূত্রে গ্রথিত করেছেন একুশের চেতনার সমগ্রতাকে।

একুশে ফেব্রুয়ারি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনকেও করেছিল আলোড়িত। একজন দৃষ্টিহীন পিতার কাছে একুশের শহিদ-সন্তানের মৃতদেহ কত গভীরতর শোকের জন্ম দেয়, সেই পিতাকে পতিত করে নিঃসীম হাহাকারে, তারই গল্পভাষ্য আনিসুজ্জামানের 'দৃষ্টি' গল্প। 'দৃষ্টি' গল্পে দেখা যায় পঁচিশ বছর কেরানিগিরি করে প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়া সাদত সাহেবের একমাত্র অবলম্বন পুত্র আসাদ। পরিবারে আরও আছে কন্যা সালেহা, পুত্রবধূ হাসিনা এবং হাসিনার অনাগত সন্তান। আসাদও কোনো এক অফিসে কেরানির কাজ করে। রাষ্ট্র ভাষা-আন্দোলনের এক পর্যায়ে আসাদের অফিসে ধর্মঘট চলে এবং মিছিল বের হয়। মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। আসাদ নিহত হয়। সন্তানহারা পিতা ঝাপসা চোখে সন্তানকে দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাকুল পিতার ব্যাকুলতা অন্তহীন।

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ স্ব-স্ব অবস্থান থেকে অংশ নিয়েছিল। প্রত্যেকেই এই আন্দোলনকে সফল করবার জন্য অনুভব করেছিল প্রাণের তাড়না। একুশ এক সর্বপ্লাবী চেতনার নাম। শুধু ঢাকা নয়, আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সর্বত্র। সিরাজুল ইসলামের 'পলিমাটি' গল্পের স্থানিক পটভূমি কোনো এক মফস্বল শহর। একুশে ফেব্রুয়ারির একদিন পর, অর্থাৎ তেইশে ফেব্রুয়ারি ওই শহরের জনমানুষের মধ্যে আন্দোলনের প্রভাব ছিল জীবন্ত। 'শহরের নীল আকাশতলে জনসমুদ্রের অশান্ত একটানা গর্জ্জন।' (পৃ. ৭৬) এমনি পরিস্থিতির মুখোমুখি জাঁদরেল পুলিশ অফিসার আবু জহির। আবু জহির বাঙালি, কিন্তু চাকরিসূত্রে সে পাকিস্তানের দাসানুদাস। আর পাকিস্তানের শাসনপদ্ধতি যে তখনও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের শেখানো নীতিতে চলমান, তা জহিরের চিন্তা ও কর্মনীতিতে স্পষ্ট বোঝা যায়। বাঙালির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করতে সে গ্রহণ করে ষড়যন্ত্রের আশ্রয়। অ্যাডিশনাল এসপি খয়রাত আর আইবি-র হায়দার খানকে দিয়ে তৈরি করতে চায় দাঙ্গা। ছড়িয়ে দেয়া হয় সরকার-বিরোধী লিফলেট। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী দাঙ্গা যখন অত্যাসন্ন তখন এগিয়ে আসে অবাঙালি কিন্তু শান্তিপ্রিয় হামিদ। হামিদ বুঝতে পারে শাসকগোষ্ঠীর অভিসন্ধি। তার বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপে দাঙ্গা থেকে রক্ষা পায় শহর ও শহরের মানুষ। বাংলার সাধারণ মানুষ যে পলিমাটির মতোই সরল, নরম তা গল্পের সাধারণ মানুষের সারল্য ও দেশপ্রেম থেকে অনুধাবন করা যায়।

একুশে ফেব্রুয়ারির সঙ্গে বহু দিনের ও বহু মানুষের সম্পৃক্তি নিঃসন্দেহে এই আন্দোলনকে করে তুলেছে জনঘনিষ্ঠ। মানুষের নিত্যদিনের জীবনযাপন, দাম্পত্য, বন্ধুত্ব, সুখ-দুঃখ সবকিছুর সঙ্গে এই আন্দোলন নিজেকে যুক্ত করেছে নিবিড় অনিবার্যতায়। আতোয়ার রহমানের 'অগ্নিবাক' গল্পে পাওয়া যায় একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার, যারা এক সময় ছিল ওপার বাংলার বাসিন্দা – উলুবেড়ের বাসিন্দা – দেশভাগোত্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে রক্ষা পেতে চলে আসে ঢাকায়। পুত্র মণিকে

নিয়ে দরিদ্র বাবা-মা বুনে চলে স্বপ্নের জাল। সদাচঞ্চল মণি ঢাকায় এসে জড়িয়ে পড়ে ভাষা-আন্দোলনে। পিতৃবন্ধুর কন্যা মাহবুবার সঙ্গে বিবাহ তাকে ঘরে ধরে রাখতে পারে না। অতঃপর আন্দোলনের সূত্রে ইউসুফের সঙ্গে মণির বন্ধুত্ব। ইউসুফ ও মণির আড্ডায় দেশের দুই অঞ্চল ত্রিপুরা ও উলুবেড়ের আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে আনন্দঘন কথোপকথন শোনা যায়। আঞ্চলিকতার পার্থক্য থাকলেও তারা দুজনই ভালোবাসে তাদের প্রিয় ভাষা বাংলাকে। এর মধ্যে চলে আসে একুশে ফেব্রুয়ারি। পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হয় মণি। পুলিশি হয়রানি এড়াতে ইউসুফ রক্তাক্ত মণিকে হাসপাতালে নিতে পারে না। বাড়িতে মৃত্যু হয় মণির। সান্ত্বনাহীন মণির মা ইউসুফের কণ্ঠে শুনতে পায় 'মা' ডাক। এক সন্তান মারা যায়, কিন্তু হাজার সন্তান ফিরে আসে।

প্রকরণগত দিক থেকে সংকলনভুক্ত গল্পগুলো কতটুকু সার্থক সে প্রশ্ন থেকে গেলেও একুশের আবেগরঞ্জিত গল্পগুলো চেতনায় অনেক বেশি সজীব ও জীবন্ত। এছাড়াও ভাষাগত দিক থেকে শব্দচয়নে প্রত্যেক লেখকের আন্তরিক প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পারতপক্ষে প্রায় সকলেই এড়িয়ে গেছেন আরবি ফারসি শব্দ। অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছেন খাঁটি বাংলা ও তৎসম শব্দ।

মুর্তজা বশীরের (জ. ১৯৩৩) 'একটি বেওয়ারিশ ডায়েরীর কয়েকটি পাতা' ও সালেহ আহমেদের 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত স্বাক্ষর শীর্ষক রচনা দুটিকে 'একুশের নকশা' অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলোও এক ধরনের গল্প। একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে আরও জীবন্ত ও চলিষ্ণু করে উপস্থাপন করা হয়েছে রচনা দুটিতে। মুর্তজা বশীর তাঁর লেখায় ওই দিন ছাত্র-জনতার মিছিল, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নানা মত ও মতদ্বৈততা, অতঃপর ১৪৪ ধারা ভেঙে গণপরিষদের দিকে যাত্রা – এইসব ঘটনাকে একটি নাম-ঠিকানাহীন ডায়রি লেখার রীতিতে উপস্থাপন করেছেন। সালেহ্ আহমেদও অভিন্ন বিষয়কে গুলি, টিয়ার শেল, পুলিশি নির্যাতন, হাসপাতালে রোগীদের অবস্থা ইত্যাদি অনুষঙ্গে তাঁর লেখায় তুলে এনেছেন।

একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলনগ্রন্থ থেকে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আবদুল গাফফার চৌধুরী (জ. ১৯৩৪) রচিত একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী'। এই গান ও একুশে ফেব্রুয়ারি আজ অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। এই গান আলোড়িত করেছিল পুরো বাঙালি জাতিকে। এই গান মুক্তিযুদ্ধপূর্ব সময়ে আমাদের জাতীয়তাবাদী বোধকে করেছিল শাণিত। একুশের সংকলনগ্রন্থে প্রকাশ পাবার আগেই গানটিতে সুরারোপ করেন আবদুল লতিফ। তাতে ছিল রণসংগীতের সুর। পরবর্তীকালে সংগীত পরিচালক আলতাফ মাহমুদ তাতে চার্চীয় রীতির সুর প্রদান করে গানের ব্যঞ্জনাকে বাঙালির সত্তায় গেঁথে দেন। গানটির অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য –

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি ।

গানটি বেশ দীর্ঘ – ত্রিশ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট । তবে গীত হয় প্রথম কয়েকটি চরণ ।

'একুশের গান' অংশে তোফাজ্জল হোসেনের গানে স্মরণ করা হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি এবং একুশের শহিদদের আবাহন করা হয়েছে সংগ্রামী অভিযানে সকলের ঐকান্তিক অংশগ্রহণ ।

কবির উদ্দিন আহমেদ 'একুশের ঘটনাপঞ্জী'তে একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমি ও কালানুক্রমিক বর্ণনা করেছেন । ১৯৪৮-এ রাষ্ট্র ভাষা-আন্দোলনের যে সূত্রপাত ঘটে, ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণায় সেই আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে । এরপর ৩০শে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালন ও ছাত্রসভা থেকে সেই আন্দোলন গতি লাভ করে । গঠিত হয় 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' । ৪ঠা ফেব্রুয়ারিতে স্থির হয়, ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রদেশব্যাপী পালিত হবে সাধারণ ধর্মঘট । এই লেখায় পাওয়া যায় ধর্মঘট সফল করার প্রস্তুতির বিভিন্ন তথ্য । বিস্তৃতভাবে আছে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঘটে যাওয়া ধর্মঘট-মিছিল-সভা-'দশজনী মিছিল'-পুলিশের গুলি ও নিহত হবার প্রত্যক্ষ বর্ণনা । ২১শে ফেব্রুয়ারির পরেও ২২শে ফেব্রুয়ারির উত্তাল ঢাকা শহরে ঘটনাপ্রবাহের বিশ্বস্ত বর্ণনা আছে এই রচনায় । ২৫ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত সরকারি দমন-তৎপরতা, গ্রেফতার ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন ।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারি । *একুশে ফেব্রুয়ারি* সেই আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দলিল, যার প্রধান কাণ্ডারি হাসান হাফিজুর রহমান । তিনি কেবল সম্পাদনাই করেননি, বাঙালির আত্মপরিচয়গত সংকট-মোচনে ও নতুন পরিচয় নির্মাণের ক্রান্তিকালে পালন করেছেন ঐতিহাসিক দায়িত্ব । একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসংকোচে ও সামষ্টিকভাবে প্রতিবাদ করতে পেরেছিল তখনকার তরুণরা । আশঙ্কা ও নতুন আশাবাদের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ভাষা-আন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারির প্রজ্বলিত চেতনাকে সফলভাবে শিল্পরূপ দিতে পেরেছিলেন তাঁরা । সেই সঙ্গে নতুন ধারার সাহিত্য নির্মাণের এ এক সফল সূচনা । বলা যায়, *একুশে ফেব্রুয়ারী*-রই যোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্যধারা ।

তথ্যনির্দেশ

১. বর্তমান প্রবন্ধে *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনগ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে পুঁথি পত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯ সংস্করণ থেকে।

২. ১৯৫০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল কবিতা সংকলনগ্রন্থ *নতুন কবিতা;* সম্পাদক ছিলেন : আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খান। তবে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য সংকলনগ্রন্থ হিসেবে *একুশে ফেব্রুয়ারী* স্বীকৃত।

৩. এই তথ্যটি পাওয়া যায় *একুশে ফেব্রুয়ারী*র ১৯৮৯ সংস্করণের প্রকাশক সুস্মিতা সুলতানার 'প্রকাশিকার নিবেদন' থেকে। তবে রফিকউল্লাহ খান তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন – '১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়। (পৃ. ২৪)

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৪), *কথামালা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯), *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল, ঢাকা।

মোহাম্মদ সুলতান (১৯৮৩), 'অন্তরঙ্গ কথামালা', *হাসান হাফিজুর রহমান* (সম্পাদক : খালেদ খালেদুর রহমান), ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৩), *হাসান হাফিজুর রহমান : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।